পাকিস্তান-ইসরায়েল

নতুন বন্ধু

পাকিস্তান ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে। নেপথ্যে রয়েছে বিপুল স্বার্থ। অনুসন্ধান করেছেন জামান আরশাদ

মুসলিম দেশগুলো সাধারণত ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে চায় না। এর প্রধান কারণ ইসরায়েল একটি ইহুদি দেশ। তারা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি দখল করে সেখানে ইহুদি বসতি গড়ে তুলেছে। জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটা ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পরের কথা।

কিন্তু কালে কালে অনেক মুসলিম দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তবে যেসব মুসলিম দেশ ইহুদি রাষ্ট্রটির সঙ্গে সম্পর্ক করেছে, তারা অন্য মুসলিম দেশগুলোর কাছ থেকে প্রবল সমালোচনা ও নিন্দার মুখোমুখি হয়েছে। কারণ ইসরায়েল এখনও তার অবস্থান থেকে সরে আসেনি। একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের কোনো সম্ভাবনা এখনও জাগেনি।

এই অবস্থার মধ্যে সম্প্রতি বিশ্ব রাজনীতিতে ঘটে গেছে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পাকিস্তান-ইসরায়েল কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। যে পাকিস্তান সব সময়ে 'বিশ্ব মুসলিমের স্বার্থ রক্ষাকারী দেশ' হিসেবে নিজেদের দাবি করে এসেছে, তারা ইহুদি রাষ্ট্রটির সঙ্গে কোনো সম্পর্কের কথা চিন্তা করবে, তা এই মুহূর্তে কেউ চিন্তাও করেনি।

সম্প্রতি পাকিস্তান ও ইসরায়েলের মধ্যে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে একটি বৈঠক হয়েছে। আয়োজক স্বয়ং তুরস্ক। এটা ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। বৈঠকে অংশ নেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুরশিদ মাহমুদ কাসুরি ও ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলভান শ্যালোম। বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে গাজায় দখলদারিত্বের অবসানের পরে পাকিস্তান ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ককে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরদিকে সিলভান শ্যালোম বলেছেন, শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। এই বৈঠকের পর এখন আগামী সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ 'আমেরিকান জিউশ কংগ্রেসে' ভাষণ দেবেন। এই প্রথম এ ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে বৈঠকে বসার ব্যাপারে পাকিস্তানের তরফে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সরিয়ে নিয়ে ৪০ বছরের দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়েছে। এখন আর তাদের সঙ্গে দূরে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। এটা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে পাকিস্তানের যুক্তি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যারা পাকিস্তানের এই কথায় বিশ্বাস করছেন, তারা ভুল করছেন। পাকিস্তান ইহুদি প্রত্যাহারের বিষয়টি অজুহাত হিসেবে উপস্থাপন করছে। আসলে তারা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছিলো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার। কিন্তু পাচ্ছিলো না কোনো অজুহাত। এবার তারা অজুহাত পেয়েছে।

দুই দেশের নেতাদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, এর আগেও পাকিস্তান-ইসরায়েলের মধ্যে বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠক হয়েছে। ২০০৩ সালে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কী না তা নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছিলেন। এরপর দু দেশের সচিব পর্যায়ে একাধিক গোপন বৈঠক হয়। ওয়াশিংটনে ইসরায়েলের সাবেক রাষ্ট্রদূত জালমান শোভালের কথা থেকেই তা স্পষ্ট। তিনি সম্প্রতি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ও আমলাদের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। গত বছর দাভোসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। যদিও পাকিস্তান এই বৈঠকের কথা স্বীকার করে না।

হাত মিলিয়েছেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী : কাসুরী-শ্যালম

দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মনে করে, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলে আরব দেশগুলোই লাভবান হবে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল মোশারফের সহপাঠি চৌধুরী সুজাত হোসেইন মনে করেন, আমরা ইহুদি পরিবারে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছি, তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেই যত বাধা?

এ বছরের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রভাবশালী পত্রিকা 'দি নিউজ' ইসরায়েলের উপ প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেসের সাক্ষাৎকার ছেপেছিলো। তাতে পেরেস বলেন, দুটি দেশের সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। তাতে কোনো দেশেরই লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। তার এ বক্তব্য ছাপা হওয়ার পরে উত্তেজিত জনতা ওই পত্রিকা অফিসে হামলা চালায়। ভাংচুর করে। এই হামলায় জড়িত ছিল কট্টরপন্থি রাজনৈতিকরা।

সম্প্রতি পারভেজ মোশাররফ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও সোদি বাদশাহ আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। তারা দুজনেই এ ব্যাপারে

হারিকেন ক্যাটরিনা

কৃপা বঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গরা

একটি সামুদ্রিক ঝড় পরিবর্তন করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। এটা যেন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মতই বিপর্যয়। ওই সময়ের আত্মঘাতী হামলায় যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বিস্মিত হয়েছিল, এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সেভাবে বিস্মিত হয়েছে। বলতে গেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে যুক্তরাষ্ট্র এখন হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে আছে। একইসঙ্গে বের হয়ে এসেছে মার্কিনিদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব।

ঝড়টির নাম ক্যাটরিনা। এটি প্রথমে বুশের ছোট ভাই জেব বুশের অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডায় আঘাত হানে। (এই ফ্লোরিডায় জেব ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী বিশ্বের বাঘা বাঘা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়েছেন। মিয়ামি বিচে তাদের বড়বড় বাড়ি করে দিয়েছেন।) ক্যাটরিনা এরপর মেক্সিকো উপসাগরে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুইজিয়ানা, মিসিসিপিতে। যুক্তরাষ্ট্রের এই তিনটি অঙ্গরাজ্যই উপকূলীয়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয় লুইজিয়ানার নিউ অরলিয়ন্স শহরের। তীব্র ঝড়ো হাওয়ার ক্যাটরিনার সঙ্গে ধেয়ে আসা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস লুইজিয়ানার নিউ অরলিয়ন্স শহরের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত করে। তার ওপরে শহরের মূল বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর লোকজন বাঁধ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়। ওই শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় সাত লাখ অধিবাসী বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় থাকেন। দেখা দেয় পানীয় জলের অভাব। উদ্ধারের আশায় মানুষজন তাদের বাড়িঘরের ছাদে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু সরকারি উড়োজাহাজ এসে তাদের উদ্ধার করে না। এর ওপরে সেখানকার মানুষজনের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ মেতে ওঠে লুটপাটে। বনার্ত্য মানুষকে ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে।

নিউ অরলিয়ন্স শহরে একটি সম্মেলন কেন্দ্রে আশ্রয় পান ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ। কিন্তু সেখানে খাদ্য, পানীয় ও স্যানিটেশনের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। একেবারে পশুর মতই তারা জীবন যাপন করতে হয়, যেন বদ্ধ গোয়ালে বেধে রাখা হয়েছে কয়েক হাজার চতুষ্পদ প্রাণীকে। মানবাধিকার রায় দৃঢ় অঙ্গীকার করেছে যে দেশ, সেই যুক্তরাষ্ট্রেই এমন কান্ড হয়।

কিন্তু কেন? সরকার সেখানে উদ্ধার তৎপরতা, আইন-শঙ্খলা রায় অতটা গুরুত্ব দেয়নি কেনো? এর প্রধান কারণ এলাকাটি কৃষ্ণাঙ্গ প্রধান। শেতাঙ্গরা সেখানে সংখ্যালঘু। মানুষজন কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল। রিপাবলিকানদের সেখানে ভোটার কম। (মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গরা বরাবরই ডেমোক্রেটদের পতাকাতলে থাকছে পছন্দ করেন। ধনী ও রক্ষণশীলদের দল রিপাবলিকান পার্টি তাদের একদম পছন্দ নয়) এ কারণে উদ্ধার কাজে শৈথিল্য! টেক্সাসের শ্বেতাঙ্গরা যেমন মার্কিন নাগরিক, তেমনি নিউ অরলিয়ন্সের কৃষ্ণাঙ্গরাও মার্কিন। তাহলে একই দেশে বসবাস করে, অভিন্ন সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে, অভিন্ন আইন মেনে চলে তাদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এ ঘটনার মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন তাদের ভিতরের কুৎসিত রূপটি দেখিয়ে দেয়।

সমালোচনার মুখে শেষপর্যন্ত বুশ সদ্য ইরাক থেকে ফেরা ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের ৩০০ জনের একটি দলকে সেখানে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে মোতায়েন করেন। লুটপাটকারীদের দেখামাত্র গুলি করার অনুমতি দেন। কিন্তু

তাতেও পরিস্থিতি উন্নতি হয়নি।

ক্যাটরিনার ছোবলকে আমরা ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। সেটা ছিল সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বিপর্যয়। সেই মাপেরই একটা জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হলো ক্যাটরিনা।

যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে বেড়ায়। এখন তাদের সহায়তা করছে অন্যান্য দেশ। এ থেকে বোঝা যায়, বিপর্যয়ের মাত্রা। এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর লুইজিয়ানায় সামরিক হেলিকপ্টার পাঠায়। অস্ট্রেলিয়া ২০ জন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষজ্ঞের দলকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। জাপান সরকার পাঁচ লাখ মার্কিন ডলারের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব যুক্তরাষ্ট্রের পাশে সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, কফি আনান সাধারণত আফ্রিকার দেশগুলোকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের আহবান জানান। কিন্তু এবার যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়ার আহবান! কেমন যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

ক্যাটরিনায় মারা গেছে ১০ হাজার মানুষ। এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান। যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করেনি। নিজেদের ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্র কখনও স্বীকার করে না। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় শিক্ষা হয়ে থাকবে।

জামান আরশাদ

ইতিবাচক সম্মতি দেন।

যদিও পাকিস্তান বলেছে, তারা এখনই ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পরেই তারা এ নিয়ে ভাববে। তবে পাকিস্তানের এ কথা বিশ্বাস করছেন না প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ড. হাসান আসকারি রিজভি বলেন, এই বৈঠক ইসরায়েলকে স্বীকৃতিক দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।

বিশ্লেষকরা বলছেন, পাকিস্তান সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে ইসরায়েলের সঙ্গে বৈঠক করেছে। প্রথমত, পাকিস্তান মনে করে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয়ত অস্ত্রের স্বার্থ। পাকিস্তান ঐতিহাসিকভাবে অস্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে গেলেই ভারত ও ইসরায়েলি লবি বাধা দেয়। ড. রিজভি মনে করেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলেই এ সমস্যা দূর হতে পারে। এর মাধ্যমে ভারতকেও চাপে রাখতে পারবে পাকিস্তান।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে বৈঠক পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কতটা উপকারে আসবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। তবে এটা যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে, তাতে সন্দেহ নেই। তার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা পাকাপোক্ত হলো। আবার তার ব্যক্তিগত ঝুঁকিও কী বেড়ে গেলো না?